খাদ্য-ভূমি-জলে জন-অধিকারঃ ঘোষণা-বাস্তবতা ও করণীয় (খসড়া)

এ.কে.এম. মাসুদ আলী
নির্বাহী পরিচালক. ইনসিডিন বাংলাদেশ[১]

আমাদের বিবেচনায় উৎপাদনশীল প্রাকৃতিক সম্পদ -বিশেষত ভূমি ও জলে নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত না হলে খাদ্যকে ঘিড়ে নিরাপত্ত, অধিকার ও স্বার্বভৌমত্বের ভাবনা কার্যকর ও টেকসই নয়। এই বিবেচনা থেকেই এ আলোচনার সূচনা।

১. খাদ্য নিরাপত্তা, অধিকার ও স্বার্বভৌমত্বের ভাবনা

খাদ্য নিরাপত্তা একটি বেশ জনপ্রিয় ধারণা তথাপি প্রায়শই একে ভূল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর উপর এমন সব প্রত্যাশা ও মূল্যবোধ আরোপ করা হয় যার থেকে এই ধারণাটির দূরত্ব যোজন যোজন- যেমন খাদ্য-অধিকার ও খাদ্য স্বার্বভৌমত্বকে প্রায়শই এর সাথে একই কাতারে রাখা হয়। একারণে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি খাদ্য স্বার্বভৌমত্ব ও খাদ্যাধিকারে ধারণাকে উপস্থাপন ও তূল্য-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণাসমূহের আন্ত-সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করা জরুরী বিচার করছি। তবে শুরুতেই বলে রাখা সঙ্গত যে , "খাদ্য নিরাপত্তা" হচ্ছে একটি কারিগরী ধারণা; "খাদ্য সার্বভৌমত্ব" হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ধারণা ও "মানসম্মত যথার্থ পরিমাণ খাদ্যের অধিকার" একটি আইনী ধারণা।

১.২ খাদ্য নিরাপত্তা এবং এর নির্দেশকসমূহ

খাদ্য নিরাপত্তা একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এটি একদিকে যেমন দেশে তথা বিশ্বে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের প্রাপ্যতা কা যোগান নির্দেশ করে, অন্যদিকে তেমনি যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টি ও সুস্থতাকেও হিসাবে নেয়। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি, ১৯৮০ সালে খাদ্য নিরাপত্তাকে একটি ত্রি-পাক্ষিক ধারণা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে- যার মধ্যে আছে প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা ও স্থিতিশীলতার প্রেক্ষিত (এ বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো)। একই ভাবে ওইসিডি'র মতে খাদ্য নিরাপত্তা একটি ত্রি-মাত্রিক ধারণা- প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা ও ব্যবহার উপযোগীতা- এবং একই সাথে ওইসিডি জানাচ্ছে যে খাদ্য নিরাপত্তাকে সহজ অর্থে খাদ্যের প্রাপতা বলে গ্রহণ করার এইটি প্রবণতা বিদ্যমান।[২]যে সূচকসমূহের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার পরিমাপ করার চেষ্ঠা করা হয়ে থাকে তাদেরকে দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেটে ভাগ করা যেতে পারে- এক ধরণের সূচক আছে যা চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা পরিমাপ করে এবং আর এক প্রকার সূচক আছে যা খাদ্য-ঘাটতি পূরণের সম্ভাব্য স্বক্ষমতা পরিমাপ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ খাদ্য নিরাপত্তার দুটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়কে বিশেষণ ও এগুলোর ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রবণতাগুলো নির্ণয়ের প্রচেষ্টা নিয়েছে। বিষয় দুটো হলো- খাদ্যের সহজলভ্যতা ও খাদ্যের বিতরণ ব্যবস্থা।[৩] জাতিসংঘের মান অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তার ত্রিমাত্রিক নির্দেশকগুলো নিম্নরূপ: ১) খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যের সহজলভ্যতা; ২) খাদ্য নিরাপত্তার অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যথার্থ গুণগতমান ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা; ও ৩) খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটি খাদ্য নিরাপত্তার নিম্নলিখিত ৩টি বৈশিষ্টকে চিহ্নিত করেছে- খাদ্যের সহজলভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও খাদ্যের উপযোগীতা

বিশ্বের সকল দেশের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার অগ্রগতি ও সুরক্ষায় এবং সকল নারী ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণার্থে সকলের জন্য টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন, একদিকে তুলে ধরেছেন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (যার আওতায় থাকে যথাযথ পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার) আর অন্যদিকে, প্রকাশ করেছেন যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ কেবলমাতও মূল্যবোধগতভাবে মূল্যবান নয় বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রায়গিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।[৪]

---

[1] পানি অধিকার ফোরাম আয়োজিত, জাতীয় সেমিনার, ২২ অক্টোবার, ২০১৪

[2] OECD. 2002. The medium term impacts of trade liberalization in OECD countries on the food security of non-member countries. Paris: OECD.

[3] USDA. 1999. *Food Security Assessment*. USDA Economic Research Service. Situation and Outlook series GFA-11 Washington DC USDA. 1999. *Food Security Assessment*. USDA Economic Research Service. Situation and Outlook series GFA-11 Washington DC

[4] MARC J. COHEN, THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD AND FOOD SECURITY, Prepared for Presentation at the Congressional Human Rights Caucus Members Briefing on World Hunger: Moving Toward Global Food Security, Washington, DC, May 21, 2003.

১.৩ খাদ্য সার্বভৌমত্ব

খাদ্য সার্বভৌমত্ব হলো বিশ্বের সকল জনগণ, জনগোষ্ঠী ও দেশসমূহের সেই অধিকার যার মাধ্যমে তাঁদের কৃষি, শ্রম, মৎস্য আহরণ, খাদ্য এবং ভূমি সংক্রান্ত নীতিসমূহ যেগুলো প্রতিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনায় তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রণয়নের অধিকারকে নিশ্চিত করে। প্রকৃতভাবে খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদনের অধিকার অর্থাৎ সকল জনগণের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যথাযথমানের খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং খাদ্য উৎপাদনের উপায় ও সক্ষমতাকে তাঁদের নিজ নিজ সমাজের টেকসই অগ্রগতি সাধনের কাজে কার্যকর ভাবে ব্যবহারের অধিকারই হলো খাদ্য সার্বভৌমত্ব।

খাদ্য সার্বভৌমত্বের কাঠামো কৃষকের খাদ্য উৎপাদনের সক্ষমতা বজায় রাখা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎপন্নের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য একটি নতুন নীতিকাঠামো প্রণয়ন করা জাতিসংঘের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এই নীতিকাঠামোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন-

- স্থানীয় এবং আঞ্চলিকভাবে জনগণের খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান, ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের ভূমি, পানি, বীজ এবং ঋণ প্রাপ্তির অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান। এর সাথে ভূমি সংস্কার, জীন পরিবর্তিত শস্যাদি প্রবর্তন প্রতিরোধ, বিনামূল্যে বীজ প্রাপ্তির অধিকার এবং জলের উৎস্যসমূহকে জনগণের সাধারণ সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণের বিষয়কেও যথাযথ গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।
- কৃষক ও ক্ষুধে কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনের অধিকার এবং কার দ্বারা উৎপাদিত, কি ধরণের খাদ্য ভোক্তারা চান তা পছন্দের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি উৎপন্নের মূল্য নির্ধারিত হবে কৃষি উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারনে কৃষক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী নারীদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে হবে
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘকে নতুন একটি নীতি কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে- ক) স্থানীয় ও আঞ্চলিক চাহিদাভিত্তিক উৎপাদনকে রফ্তানির আগে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে, বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলসমূহকে কৃত্রিমভাবে হ্রাসকৃত মূল্যের আমদানি থেকে সুরক্ষার অধিকার দিতে হবে; খ) কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা রফ্তানি বা পণ্যমূল্যের ওপর গুরুতর প্রভাব না ফেলে।
- সরবরাহ ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যে মূল্য স্থীতিশীল রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.৪ খাদ্য অধিকার

মানসম্পন্ন ও যথেষ্ট পরিমান খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষুধা মুক্তি এবং খাদ্য অধিকারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বিষমুক্ত খাদ্য প্রাপ্তি এবং বিষমুক্ত, সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সহনীয় এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধারাবাহিক সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানকারী।

বর্তমান খাদ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা এবং চালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশসহ এশিয়ার অনেক দেশেরই- মৌসূমী অনাহার বা দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি বা চলমান খাদ্যাভাব এবং দারিদ্রের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, এশিয়া-প্রশান্ত অঞ্চলে ৫০ কোটি মানুষ দীর্ঘমেয়াদী খাদ্যাভাবে ভুগছে। এক হিসাব মতে, যদিও কৃষি উৎপাদন, বাংলাদেশে গত ৩০ বছরে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা এবং শস্য বহুমুখীকরণের ফলে উল্যেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার পরেও ১৬ কোটি মানুষের ভিতর ৪৫ শতাংশ প্রতিদিন তাদের প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কম ক্যালরি গ্রহণ করে থাকে। এক হিসাবে ৫৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে।

আমরা জাতীয় উৎপাদন ও ভোগের বা সরবরাহ ও চাহিদার তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ না করে জাতীয় ও নীতি ও কর্মপরিকল্পনার পরিসর থেকে খাদ্য নিরাপত্তার সাথে নাগরিক অধিকারে প্রসঙ্গকে বিচার করে দেখব। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় খাদ্য নীতি(২০০৬) এর উপর ভিত্তি করে একটি কর্মকৌশল (২০০৮-২০১৫) প্রণয়ন ও অনুমোদন করেন। এ পরিকল্পনায় খাদ্যনীতির তিনটি মূল লক্ষ্যকে কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য কর্মকৌশলে রুপান্তরিত করেছে এবং এর অগ্রাধিকার ঠিক করেছে। এই উদ্যেশ্যগুলো হলো- ১) যথেষ্ট পরিমাণে এবং স্থিতিশীলভাবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা, ২) জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যথেষ্ট খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও ৩) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা। এই

পরিকল্পনার প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও বাংলাদেশে এখনও খাদ্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খাদ্য প্রাপ্যতার মাত্রা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন বহুমূখীকরণ, এর স্থায়িত্বশীলতা এবং এই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর মনযোগ দিতে হবে কৃষি বিপনন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে। অধিকিন্তু খোদ খাদ্য নীতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অধিকার হিসাবে খাদ্যকে বিবেচনায় না আনা। আসুন আমরা খাদ্যনীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেণণে সচেষ্ট হই।

১.৫ খাদ্যে জন-অধিকার কেন্দ্রিক প্রস্তাবনাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় অধ্যায়; ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে " *রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন , যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;"*। সুতরাং সংবিধান স্বীকার করে যে কৃষি নিছক বাণিজ্যের কোন বিষয়সূচি নয় ; এটি প্রাথমিকভাবে নাগরিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িতের সাথে সম্পর্কিত্ব। খাদ্যের অধিকার বলতে শুধুমাত্র প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল উৎপাদন এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তাকেই বেঝায় না। এর সঙ্গে আরো জড়িত রয়েছে কৃষক এবং পরিবেশের পর্যাপ্ত খাবার এবং আশ্রয়ের আইনি অধিকার।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাজার ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি/ ব্যবস্থাকে পুর্নমূল্যায়ন প্রয়োজন কারণ কৃষকদের জীবিকার নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রের ভূমিকা, যা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব , সেগুলো লঙ্ঘন করছে বাণিজ্য চুক্তিগুলো। এ ক্ষেত্রে খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণা একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। খাদ্যশস্য আমদানি জাতির উপর ঋণের বোঝা আরোপ করে, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ ক্রয় কার্যক্রম, মজুদ পদ্ধতি ও অবকাঠামো কৃষকদের বড় একটি অংশকে বাদ দিচ্ছে। এর পিছে আছে প্রযুক্তিগত বাধা, নীতিগত গুরুত্বের অভাব, পক্ষপাতিত্বমূলক বাস্তবায়ন এর কারণে। খাদ্য উৎপাদনের বহুমূখীকরণ, খামার পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রাধিকার এবং কমিউনিটি/গ্রাম ভিত্তিক মজুদ বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। এ ছাড়াও কৃষকদের সমবায়/যৌথ উৎপাদন এবং বিপণন কাঠামো তৈরি করা হলে তারা বৃহৎ সরবরাহকারী হিসাবে কর্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ ব্যবস্থাগুলো উৎপাদন ও বিপণন খরচ কমাবে-যা আবার সামগ্রিকভাবে খাদ্যের খরচ কমাবে।

একই সময়ে আমরা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলো একটি সমন্বিত নীতি, আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনার, যার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ। এ প্রেক্ষিতে;

- আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারকে আমাদের সাংবিধান ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ/ কনভেন্টস ইত্যাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হবে।.
- জাতীয় খাদ্য নীতি এমন হতে হবে যা কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং জীবিকার নিশ্চয়তা দিবে কারণ খাদ্য শুধুমাত্র বিপণন ও বানিজ্যের উপযোগী পন্য নয়- অধিকার ও জননিরাপত্তার অনুষঙ্গ।
- খাদ্যের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ হতে হবে নির্দিস্ট সময়ে (মৌসুমের শুরুতেই), যাতে করে প্রকৃত কৃষকেরা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে খামার পর্যায়ের পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে (যেমন- চাল নয় বরং ধান)। এছাড়াও সরকারি খাদ্য ক্রয় কার্যক্রম পরিকল্পনায় খাদ্য সম্পর্কিত জাতিগত বৈচিত্রকে বিবেচনায় নিতে হবে। সরকারি খাদ্য ক্রয় কার্যক্রমের এই উপাদানগুলো আইনি বাধ্যবাধকতার ভিতর নিয়ে আসতে হবে।
- সরকারী পর্যায়ে বিকেন্দ্রীত খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিটি/গ্রাম- ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারি খাদ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে কৃষকদের তথ্য প্রদান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এবং তৎসম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের জন্য ডিজিটাল (হালনাগাদ তথ্য-যোগাযোগ) প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।
- কৃষিকে বাণিজ্য অধিকারের অংশ হিসেবে না দেখে বরং খাদ্য অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনা করে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করতে হবে যা বিবেচনায় রাখবে জাতিগত বৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত সুরক্ষা মত সংবেদনশীল বিষয়সমূহ।

২. ভূমি অধিকার ও বাংলদেশের কৃষক

বাংলাদেশে ভূমিহীনতার মাত্রা ১২.৮৪ শতাংশ, যা ১৯৯৬ সালে ছিল ১০.১৮ শতাংশ, আর ১৯৮৩-৮৪ তে ছিল ৮.৬৭ শতাংশ (বি.বি.এস.)। সরকারি হিসাব মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৩৩ লক্ষ একর খাস জমি রয়েছে। দেশের ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে এই জমি, পরিবার-পিছু আধা একর বা ৫০ শতাংশ করে বিতরণ করা হলেও এই পরিবারগুলো দারিদ্র সীমার উপরে উঠে আসতে পারতো এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে পারতো। এই ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেশী! ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিয়য়ক প্রতিষ্ঠান (এফ.এ.ও)' এর হিসাব মতে বাংলাদেশে নারীর মালিকানাধীন কৃষি জমির পরিমান ছিল মাত্র ৩.৫ শতাংশ। প্রায় বিশ বছরে এই মালিকানা হ্রাস পেয়ে ২ শতাংশে নেমে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইপিসিসি'র প্রক্কলন অনুযায়ি বাংলাদেশে গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ১০

লক্ষ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অন্য গবেষণায় (স্টেন, ২০০৭; সারওয়ার ও খান) বলা হচ্ছে, আমাদের সমুদ্র উপকূলের ১৮ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যেতে পারে। আর একটি গবেষণা অনুযায়ি এরই মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষ তাদের আবাস হারিয়েছেন এবং তাদের ৭০ শতাংশ ভূমিহীন হয়ে পরেছেন।[৫]

এছাড়াও নগরায়ন, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও আবাসনের সম্প্রসারণের কারণে প্রতি বছর আমরা ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। উল্লেখ্য, নগরায়ন, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও আবাসনের সম্প্রসারণের মত ক্ষেত্রগুলোতে সরকারের উন্নয়ন কৌশল ও কার্যক্রম প্রভাব ফেলে ও ভূমি ব্যবহার ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে খাস জমি তথা কৃষি খাস জমির উপরও চাপের সৃষ্টি করে। এটি সাধারণভাবে কৃষি জমি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ও তার পাশাপাশি কৃষি খাস জমি অকৃষিখাতে হস্তান্তর রোধের প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করে। অন্য দিকে, ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি হস্তান্তরের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কৃষি খাস জমি সরকারের হাতে থাকা ও তা কার্যকরভাবে কৃষকের হাতে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তাও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, ভূমিহীনতার গতি ধারা ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা প্রভৃতি সূচককে বিবেচনায় নিলে ভবিষ্যতে কৃষি খাস ভূমি সুরক্ষা ও বন্টন প্রক্রিয়াকে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের প্রাসঙ্গিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে মতে বাংলাদেশের মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৭ লাখ ৬৩ হাজার একর যার মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৮০ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর। এর এক-চতুর্থাংশই এখন হুমকির মুখে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে, বছরে বাড়ছে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ। দিনে ২২০ হেক্টরের বেশি কৃষি জমি অকৃষি খাতে যাচ্ছে। বছরে কমছে ৮২ হাজার হেক্টর জমি। যা মোট জমির এক ভাগ। বছরে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে এক হাজার হেক্টর জমি। ৮০ শতাংশ সরকারী খাস জমিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। নির্মাণ কাজের কারণে বছরে বিলীন হচ্ছে তিন হাজার হেক্টর জমি। গত ৩৭ বছরে শুধু ঘরবাড়ি নির্মাণ হয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার একর জমিতে ও গত পাঁচ বছরেও আলোর মুখ দেখেনি জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০১০ এবং কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন-২০১০। তবে বর্তমান ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, জমির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে চলতি বছরের মধ্যেই নীতিমালা তৈরি করবে সরকার।[৬]

বিভিন্ন গবেষণা থেকে কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কাজনক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন সরকারের নিজেস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলাদেশের কৃষিজমি বিলুপ্তির প্রবণতা" শীর্ষক গবেষণা অনুয়ায়ী, ২০০০ সাল পরবর্তী ১২ বছরে দেশে প্রতিবছর ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। বিভাগওয়ারি অকৃষি খাতে জমি চলে যাওয়ার প্রবণতা চট্টগ্রাম বিভাগে বেশি। চট্টগ্রাম বিভাগে প্রতিবছর ১৭ হাজার ৯৬৮ হেক্টর জমি, রাজশাহী বিভাগে ১৫ হাজার ৯৪৫ হেক্টর, ঢাকায় ১৫ হাজার ১৩১ হেক্টর, খুলনায় ১১ হাজার ৯৬ হেক্টর, রংপুরে ৮ হাজার ৭৮১ হেক্টর, বরিশালে ৬ হাজার ৬৬১ হেক্টর জমি প্রতিবছর অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। গবেষণা পত্রসমূহ থেকে আরও জানা যায় যে-

- গত ৩৮ বছরের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে ১ দশমিক ২৪২ মিলিয়ন হেক্টর।
- প্রতিবছর দেশের ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর চাষাবাদ যোগ্য জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের এক গবেষণা অনুযায়ী ১৯৭২-২০০৯ সাল পর্যন্ত:

- ২৬ লাখ ৬৬ হাজার ৮৫৬ একর জমি অকৃষি খাতে চলে গেছে।
- ঘরবাড়ি নির্মাণ হয়েছে ৬৪ হাজার ৪৮৯ একর জমিতে।
- দোকান নির্মাণ হয়েছে ৬ হাজার ২৬২ একর জমিতে।
- কলকারখানা নির্মাণ হয়েছে ২২২ একর জমিতে।
- বিদ্যালয় দুই হাজার ৮২৭ একর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৪৯৯ একর জমিতে
- মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এক হাজার ৯৯৯ একর জমিতে।

এছাড়াও সড়ক ও রেল যোগাযাগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পর্যটন ও বিনোদন অবকাঠামোর বিস্তার, সেনানিবাস স্থাপন, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা প্রভৃতি কারণেও কৃষি জমির পরিমান কমে আসছে। **ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা মোতাবেক- বিগত ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনাঃ** কৃষি জমির বিভিন্ন অকৃষি ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার ও নদী ভাঙ্গনের কারণে জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে এবং প্রতিবছর আমরা ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের সরকারি জমি যেমন চরের জমি, খাস জমি ও জলাশয়ে প্রবেশাধিকার খুব সীমিত। ভূমি বন্দোবস্ত আইন ও নীতিমালায় ভূমিহীনদের খাস জমি বরাদ্দ দেওয়ার সুস্পষ্ট বিধান থাকলেও প্রকৃত পক্ষে তাদের অধিকার সংরক্ষন করা হয় না। গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পেশীশক্তি ও টাকার বিনিময়ে এই জমি বরাদ্দ নেয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলসহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ এই সব ভূমিদস্যূদের কারণে তাদের জমিতে অধিকার হারাচ্ছে।[৭]

---

[৫] Mahmuda Khatun; Climate Change and Migration in Bangladesh: Golden Bengal to Land of Disasters; Bangladesh e-Journal of Sociology; Volume 10, Number 2. July 2013

[৬] রাজন ভট্টাচায; জনকণ্ঠ, ৩০ মার্চ, ২০১৪

[৭] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৬৮

২,১. উন্নয়ন কৌশলে কৃষি জমি

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে চেষ্টা কবব; প্রথমত- কৃষি ও কৃষি জমি সুরক্ষার প্রসঙ্গটি কি ধরণের গুরুত্ব পেয়েছে তা দেখা এবং দ্বিতীয়ত- খাস জমি ও বিশেষত কৃষি খাস জমিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে? এক্ষেত্রে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) সারাংশের শুরুতেই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকের উল্লেখ করছে-

- প্রথমত; কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও শস্য বহুমূখীকরণ - এটি মূলত আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরায়নের যে চাপ দেখা যাচ্ছে তা মোকাবেলায় সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। [৮]
- দ্বিতীয়ত; জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নজর দেওয়া হবে- যার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমি এবং অন্যান্য অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের যে সংকট দেখা দিচ্ছে তা মোকাবেলা করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে[৯]
- তৃতীয়ত; উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে- যাতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কৌশল গড়ে তোলা যায়।[১০]
- চতুর্থত; পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া প্রণয়ণ করা হবে প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনা, বায়ু ও পানিদূষণ রোধ, খাসজমি, জলাশয় ও নদীর অবৈধ্য দখল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।[১১]
- পঞ্চমত; দক্ষতার উন্নয়ন- যার থাকছে চারটি স্তম্ভ: সরকারি পরিষেবা শক্তিশালীকরণ; স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ শক্তিশালীকরণ; এবং পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সংস্কার।[১২]

এই কৌশলসমূহের মধ্যে আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরতে চাই। প্রথমত; সরকার গ্রামীণ টাউনশিপ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে যেখানে গ্রামের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় হাউজিং, বাজার, কলকারখানা এবং বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও নীতিমালা ও দখলকৃত জমির ন্যায্য ও সাম্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌক্তিক করে তোলা হবে।[১৩] দ্বিতীয়ত; ঢাকা ভারসাম্যহীনভাবে বেড়ে উঠার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর অবকাঠামো এবং ভূমি প্রাপ্যতাও দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে যা সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভূতকরণকে ইঙ্গিত করে। কারখানা বর্ধিতকরণ ও উন্নত পরিষেবা ব্যবস্থার সাথে সাথে বাসস্থানও যাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে সেজন্য সরকার ভূমিপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে।[১৪] তৃতীয়ত, সরকার উল্লেখ করছে যে, ভূমিহীন কৃষকরা দরিদ্রের মধ্যেও দরিদ্রতম। ভূমি বসতভিটার জন্যও জরুরি। শহরে বস্তিবাসীর দ্রুত বিস্তার ও ভূমির অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি এটাই ইঙ্গিত করে যে, জনগণের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশ।[১৫]

---

[৮] কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও শস্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকের আয়মূলক কাজের সুযোগ বাড়াতে কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত কৌশল থাকা অবশ্যই জরুরি। একটি শক্তিশালী কৃষিজব্যবস্থা দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরায়নের যে চাপ দেখা দিয়েছে তাতে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে শীর্ষ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। -ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৪

[৯] কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশ পৃথিবীর বহুল জনঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গায় এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভূমি এবং অন্যান্য অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিকসম্পদের সংকট দিন দিন তীব্রতর করছে।ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে ভূমি একটি দুস্প্রাপ্য উৎপাদনের উপাদান যার কারণে সারা দেশে বিশেষকরে মেট্রো পলিটন শহরগুলোতে ভূমির মূল্য যেন অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।-ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫

[১০] ভবিষ্যতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে এই বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু টেকসই প্রবৃদ্ধিতে উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু তাই নয় সুস্থ ভূমিব্যবস্থাপনা দারিদ্র দূরীকরণ ও মানুষের কল্যানে সরাসরি প্রভাব ফেলে। -ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫

[১১] ষষ্ট পাঁচসালা পরিকল্পনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে, পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূমি ও পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের মাথাপিছু যে প্রাপ্যতা তা দ্রুতহ্রাস পাচ্ছে। ক্রমাগত মাত্রাতিরিক্ত ও বাছবিচারহীন ব্যবহার আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে অব্যবহার যোগ্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। সম্পদের মানের এই অবনতি মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য ও অন্তরায় বিশেষ করে নারী ও শিশু জ্বালানী ও পানি সংগ্রহের দায়িত্বে থাকায় তারা বেশি ভুক্তভোগী। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ষষ্ট পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কৌশলটি হবে প্রাকৃতিকসম্পদকে রক্ষা ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনা, বায়ু ও পানিদূষণ রোধ, খাসজমি, জলাশয় ও নদীর অবৈধ্য দখল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা ও সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত, গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর কৌশল অত্যন্ত জরুরি।-ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৮

[১২] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৯

[১৩] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৮

[১৪] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৬

[১৫] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫

অর্থাৎ ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার আওতায়, ঢাকার মত মেগাসিটির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ রোধ করে ভূমি সুরক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। এটি প্রকান্তরে খাস জমিকেও সুরক্ষিত করবে। একইভাবে পরিবেশগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে, খাসজমি, জলাশয় ও নদীকে অবৈধ্য দখল থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে- এটিও খাস জমি তথা কৃষির প্রাকৃতিক ভিত্তি সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ টাউনশিপ গড়ে তোলা ও গ্রামীণ ভূমিহীনদের আবাসন সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে খাস জমির হস্তান্তর বা বন্টন। এক্ষেত্রে কৃষি খাস জমিকে কত অংশে আবাসনের জন্য ব্যবহার করা হবে বা আদৌ হবে কি না সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এই প্রশ্নের মিমাংসা হওয়া জরুরী।

অন্যদিকে খাস জমি বন্টন নীতিমালায় নারীর প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে- তা বিদ্যমান পাঁচশাল পরিকল্পনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। খাস জমিতে নারী অধিকারের প্রসঙ্গ আলোচনার শুরুতেই লক্ষ্যণীয় যে- কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা (১৯৯৮)'তে অগ্রাধিকারের তালিকায় নারীর অবস্থান রয়েছে একেবারে নীচের দিকে। সেখানে বলা আছে, **'সক্ষম পুত্র সন্তানসহ স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা' নারীর খাস জমি পাওয়ার অধিকারের কথা।** অর্থাৎ নাবালক পুত্রসন্তান বা কন্যা সন্তানের মাতা হিসেবে কোন নারী এই তালিকায় স্থান করে নিতে পারবেন না। অথচ নারী উন্নয়ন নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের অতি দরিদ্রদের দুই তৃতীয়াংশ নারীর অধিকাংশই বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা অথবা তালাক প্রাপ্ত। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনে এরকম বৈষম্যমূলক নীতি কার্যতঃ অতি দরিদ্র অধিকাংশ নারীর খাস জমি পাওয়ার অধিকারকে ব্যাহত করছে।[১৬]

একই সাথে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুযায়ি, সরকার জ্বালানী ও শক্তি, রাস্তাঘাট, নদীপথ, রেল ব্যবস্থা, বন্দর, পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, টেলি-যোগাযোগ/তথ্য প্রযুক্তি, গৃহায়ণ এবং পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে[১৭]। এক্ষেত্রেও কৃষি খাস জমি সুরক্ষা কতটুকু দেওয়া হবে তা পরিষ্কার নয়। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিবেদন ও সংবাদচিত্র থেকে উল্লেখ্য[১৮]-

- বিশ্বব্যাংকের উন্নয়নসূচক ২০০৯ অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে দেশের ২০ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করত। ২০০৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ শতাংশ। বৃদ্ধির এই হার দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ।
- নগরায়নের অনুসঙ্গী রাস্তাঘাটের বড় অংশই নির্মিত হচ্ছে কৃষিজমিতে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৩,৫৪৪ কিলোমিটার জুড়ে আছে জাতীয় মহাসড়ক। ৪, ২৭৮ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৩,৬৫৯ দশমিক ১৩ কিলোমিটার জুড়ে জেলা সড়ক রয়েছে (মোট সড়কপথের পরিমাণ ২১,৪৮১ কিলোমিটার)। এছাড়াও এলজিইডির ৮০,১১৯ কিলোমিটার পাকা সড়ক রয়েছে।
- পরিবেশ অধিদফতরের হিসেবে নগরায়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অপরিকল্পিতভাবে দেশে চার হাজার ৫১০টি ইটখোলা গড়ে উঠেছে। যে কারণে বছরে মাটি কাটার ফলে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমি ফসল উৎপদিত হয় না আর প্রায় ৫০ হাজার একর আবাদি জমি দখল করে আছে ইটখোলাগুলো।

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনায় কৃষি জমি হারানোর বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পন করে বলা হয়েছে; নগরায়ন ও শিল্পায়নের সম্প্রসারণের ফলে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে খাসশস্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কৃষি জমি কমে আসবে। আবাদি জমি স্বল্পতার সমস্যার কারণে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে।[১৯] অর্থাৎ ভবিতব্য মেনে নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রযুক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মাথায় রাখতে হবে কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ বর্তমানেই প্রায় শীর্ষ পর্যায়ে পৌছেছে এবং তা টেকসইও নয়। কাজেই কৃষি জমি হারানোকে মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়াচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্বকে বিদায় জানানো। তবে এটি কোন ত্রুটি নয়- ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার উন্নয়ন দর্শনের মাঝেই রয়েছে সচেতনভাবে এক পিচ্ছিল ও বিপদজনক উন্নয়ন পথে হাটার সিদ্ধান্ত।

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার উন্নয়ন দর্শন স্পষ্ঠ হয় দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প বিশ্লেষণে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ি- কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিল্প উৎপাদন ও সেবা খাত নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর একটি দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ। আর এর জন্য প্রয়োজন দ্রুত গতিশীল অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বক্ষমতা অর্জন। শিল্পে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার মানে এই না যে কৃষিকে অবহেলা করা হচ্ছে। বরং এটি কেবলমাত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে মেনে নেয়া। প্রথমত, কৃষির দ্রুত বিস্তার নির্ভর করে জমি প্রাপ্যতার উপর, কিন্তু কৃষি জমির পরিমান অপরিবর্তনশীল এবং চাহিদার উপর (যা আয়ের সাথে সাথে খুব বেশী হারে বাড়ে না)। আর দ্বিতীয়ত, শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হবে এমন একটি কৌশল যা কৃষির মত কম উৎপাদনশীল খাত থেকে শ্রম প্রত্যাহার করে অধিক উৎপাদনশীল কার্যক্রম যেমন শিল্প ও আধুনিক সেবা খাতে প্রতিস্থাপন করবে। কৃষিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো এবং কৃষি বৈচিত্র্যকরণের দ্বারা কম উৎপাদনশীল বা কম মূল্যমানের ফসল থেকে

---

[১৬] এ কে এম মাসুদ আলী; খাস জমিতে নারী-অধিকার প্রসঙ্গে নাগরিক প্রস্তাবনা: রাষ্ট্রের সংবিধানিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ; ইনসিডিন বাংলাদেশ; ২০১৪

[১৭] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৩৩

[১৮] রাজন ভট্টাচায; জনকণ্ঠ, ৩০ মার্চ, ২০১৪

[১৯] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৭৬

অধিক উৎপাদনক্ষম বা মূল্যবান ফসল ফলানোর যথেষ্ট পরিমান সুযোগ বিদ্যমান। এটা করা গেলে একদিকে যেমন আয় বাড়বে অন্যদিকে তেমনি নাগরিক ভোক্তাদের জন্য খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা যাবে।[২০]

অর্থাৎ ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রচ্ছন্নভাবে আশা করা হচ্ছে যে, ক্রমাগত কৃষি থেকে শ্রম প্রত্যাহার এবং ভূমির মত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপকরণকে কৃষিখাত থেকে অধিকতর উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিল্প উৎপাদন ও সেবা খাত নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করা যাবে। যদিও কৃষিকে অবহেলা করা হচ্ছে না তথাপি শিল্পখাতকে পরিষ্কার প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এই উন্নয়নধারা স্বভাবতই কৃষিকে উন্নয়ন কৌশলের অধঃস্থন মাধ্যম হিসেবে চিত্রিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ভূমি ও শ্রমকে কৃষিখাতে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা খুব একটা সহায়ক না। কৃষি খাস জমি অকৃষিখাতে বন্টনের পক্ষেও এই উন্নয়ন কৌশল শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করে। কৃষি খাস জমি সুরক্ষার চেয়েও বড় একটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য- কারণ সাধারণভাবে কৃষি জমির পরিমান কমে যাওয়ার হারকে তা বাড়িয়ে দিতে পারে। মনে রাখতে হবে, এখনও, বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখ ৮০৪ যাদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক।[২১] কাজেই, এই উন্নয়ন কৌশল প্রকান্তরে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবিকার নিশ্চয়তাকে হুমকীর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতার নিরিখে ভূমির ব্যবহার বিবেচনায় না এনে- জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার দিকটিকেও হিসেবে আনতে হবে। এছাড়া কৃষি খাসজমি সুরক্ষার প্রশ্নের মূখ্য তাৎপর্য।

সেবা খাতের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের মত খাতগুলো বিকাশের ক্ষেত্রেও ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা নজর দিয়েছে। যেমন পর্যটন খাত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; পর্যটন খাতে উন্নয়নকল্পে রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট এবং কুয়াকাটাতে (পটুয়াখালী) টেকসই ও আধুনিক পর্যটন সুযোগ সুবিধা বিকাশ করার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। [২২] এক্ষেত্রেও জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পর্যটন নীতিতে বর্তমানে কৃষি জমি তথা কৃষি খাসজমি সুরক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বৈশিষ্ট্য হলো রপ্তানী-নির্ভর উন্নয়ন। এতে একদিকে শিল্পখাতে যেমন পোশাক শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষিখাতে তেমনি চিংড়ি চাষের দিকে মনযোগ দেওয়া হয়েছে।[২৩] চিংড়ি চাষের সাথে শস্য উৎপাদনের সংঘাতের কথা স্বীকার করলেও- ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা সেটাকে স্থানীয় সরকার, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ও এনজিও সহ বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় মোকাবেলার আশা প্রকাশ করেছে।[২৪] মৎস্য বিষয়ক বার্ষিক পরিসংখ্যান (২০১১-১২) অনুযায়ী, ২০০২-০৩'এ যেখানে ১.৪১ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হতো, ২০১১-১২'তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে- ২.৭৫ লক্ষ হেক্টরে।[২৫] রপ্তানীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি জমি যেমন খাদ্য শস্য উৎপাদনের বাইরে চলে যাচ্ছে- জমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে- তেমনি কৃষকের ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও পড়ছে হুমকীর মুখে। প্রভাবশালীদের হাতে ক্ষুদ্র কৃষক জমির পাশাপাশি খাসজমিও চিংড়ি চাষের আওতায় চলে আসছে।

২.২. উন্নয়ন নীতির প্রেক্ষাপটে কৃষি জমি সুরক্ষার নাগরিক প্রস্তাবনা

দেশে যদিও কৃষিজমি অকৃষি খাতে ব্যবহার রহিত করে আইন প্রণযন করা হয়েছে- তার প্রয়োগ প্রায় অনুপস্থিত। কৃষিজমি অন্যখাতে ব্যবহার করতে হলে সরকারী অনুমোদনের বিধান থাকা স্বত্বেও তা মানা হচ্ছে না এ ছাড়াও জলাধার , বনভূমি ও পাহাড় সুরক্ষা আইন থাকলেও নেই তার যথাযথ প্রয়োগ। ২০১০ সালে ভূমি সংরক্ষণের জন্য সরকারী নীতিমালা করার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা করা যায়নি। বর্তমান ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, জমির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারীভাবে একটি ভূমি ব্যবহার নীতমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। নীতিমালাটি এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই খসড়া ঠিক হবে। চলতি বছরে তা চূড়ান্ত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।[২৬] আমরা একদিকে যেমন অনতিবিলম্বে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ (বিশেষত প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের স্বার্থ) মাথায় রেখে বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই নীতিমালার চূড়ান্ত রূপ দানের উদ্যোগ দেখতে চাই। অন্য দিকে তেমনি আশু বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি জমি তথা কৃষি খাস জমির সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ দেখতে চাই।

একই সাথে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার নীতমালার আওতায় কৃষি জমি (খাস জমিসহ) সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকেও আমরা সময়ের দাবী গণ্য করছি। সরকার বর্তমানে বিভিন্ন নীতি (চূড়ান্ত বা খসড়া) প্রণয়নে হাত দিয়েছেন (যেমন চিংড়ি নীতি)- যে সব নীতি কৃষি জমি ও বিশেষত কৃষি খাসজমির উপর প্রভাব ফেলবে তার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষক প্রতিনিধির (বিশেষত প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক প্রতিনিধির) অংশগ্রহণ ও স্বার্থের

[২০] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৪৯
[২১] সিপিডি গবেষণা পত্র, ২০১৪
[২২] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-১৬১
[২৩] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫১
[২৪] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৭০
[২৫] Ministry of Fisheries and Livestock; Fisheries Statistical Yearbook of Bangladesh (2011-2012)
[২৬] রাজন ভট্টাচায; জনকণ্ঠ, ৩০ মার্চ, ২০১৪

প্রাধান্য দেওয়াও জরুরী হয়ে উঠেছে। কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষক সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি গণমুখী কৃষি ভূমি সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি কৃষক সংগঠণসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এর পাশাপাশি উন্নয়ন কৌশলে কৃষির প্রতি তথা কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রতি যে বিরুপ দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছে তা থেকে বেড়িয়ে আসার সময় এখনই। তা না হলে শুধু কৃষি খাস জমি নয়, সাধারণভাবে কৃষি জমিই হুমকীর মুখে পড়বে। উন্নয়নকে কেবল মাথা পিছু গড় আয়ের সূচকে না মেপে- ভূমিসহ উৎপাদনশীল সম্পদে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, আয়ের অসমতা হ্রাস ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে- অবশ্যই কৃষি খাসজমি তথা কৃষি জমি সুরক্ষা অতি জরুরী করনীয়। এই ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (ভূমিহীন, নারী, আদিবাসী)'র হাতে কার্যকরভাবে কৃষি খাস জমির হস্তান্তর ও তা ব্যবহারে সহায়তা প্রদান ছাড়া উন্নয়ন কাজ থাকবে অসম্পূর্ণ ।

ভূমি মন্ত্রণালয় যদি ভূমি ব্যাংক গঠণ করে তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন তা বাজারমুখী না হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ (যেমন কৃষি খাস জমি) বৃহৎ কর্পোরেশন বা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে না দেয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব[২৭]- ভূমি ব্যাংক গঠিত হলেও, ভূমিহীনদের হাতে অবাসন ও কৃষি কাজের জন্য খাস জমি/জলা হস্তান্তর করা উচিৎ বিদ্যমান নীতি কাঠামোর মধ্যেই কোন বিনিময় বা লীজ মূল্য ব্যতিরেকেই। ভূমি ব্যাংক তার সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমিহীন নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি অনুসরণ করবে। এই নীতি বাস্তবায়নে বৃহত্তর বিবেচনায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর সমতা নিশ্চিত করা যেমন সময়ের দাবী তেমনি কৃষি ক্ষেত্রে প্রান্তিক/ভূমিহীন নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা (১৯৯৮)'তে প্রয়োজনী প্রতিবর্তন আনাও আজ সময়ের দাবী। একই সাথে উন্নয়নে জাতি ভিত্তিক বৈষম্য দূরে করতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্যও ভূমি ব্যাংকে থাকতে হবে অগ্রাধিকার। এক্ষেত্রে তাদের প্রথাগত ভূমি মালিকানা পদ্ধতির স্বীকৃতি ও আইনী সুরক্ষাও জরুরী। সাধারণভাবে, ব্যক্তি ভূমিহীন বা ভূমিহীন পরিবারের বদলে ভূমি ব্যাংক প্রকৃত ভূমিহীন সমবায় বা যৌথ সমিতিকে খাস সম্পদের বন্টনে অগ্রাধিকার দিলেও খাস জমির কার্যকর ব্যবহার ও মালিকানা ধরে রাখা সহজতর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এর পাশাপাশি আমাদের প্রত্যাশা, সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনা জলবায়ু উৎবাস্তুদের সম্ভাব্য ভূমি চাহিদা বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যাংক ভবিষ্যতদর্শী সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করবে।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখেছি যে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ই কোন না কোন ভাবে কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহারের সাথে যুক্ত বা তার উপকারভোগী। এক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নীতিপত্রেই কৃষি জমি ও কৃষি খাস জমি সুরক্ষা সমন্ধে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা কামনা করছি।

৩. জল সম্পদে গণ অধিকারঃ

আমরা জানি, বাংলাদেশে দীঘি-পুকুর, হাওর, বাঁওর, বিল, নদ-নদী, খাল ও প্লাবন ভূমি মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে মুক্ত জলাশয় অর্থাৎ নদী, খাল-বিল, বাঁওরের আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে জলমহালের সংখ্যা প্রায় ১০,১১৯ টি। ভৌত আকার, অবস্থান, বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট, ব্যাপ্তি এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে জলমহালকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (ক) পুকুর-দীঘি, (খ) বিল, (গ) বাঁওর, (ঘ) হাওর ও মরা নদী এবং (ঙ) প্রবহমান নদী। বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় এ সকল জলমহালের স্বত্বাধিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী। তবে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর এ সকল জলমহালের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ১৯৮০ সালে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের উপকার হবে এমন উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা বেশি দিন টিকেনি। আবার জলমহাল ব্যবস্থাপনা চলে আসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে। আবার প্রভাবশালীদের আধিপত্য বেড়ে যায় জলমহালগুলোর উপর।[২৮] এই প্রেক্ষাপটে জনমানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় একটি আইনী কাঠামো অত্যন্ত জরুরী - জনমানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করবে।

অবশ্য বর্তমান নীতি ও বিদ্যমান আইন উভয়ই জল-সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করছে। নীতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সরকার সমতাপূর্ণ বণ্টন, কার্যকর উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জল ব্যবস্থাপনার অধিকার সংরক্ষণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় এই সম্পদের উপর আইন ও নীতি কতটুকু জনমানুষের অধিকার সংরক্ষণ করছে? জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনায়, গণমানুয়ের বদলে বেসরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থার অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। তাদের দেখা হয়েছে বিনিয়োগের উৎস হিসেবে। এর আওতায় বলা হয়েছে যে, বেসরকারিখাত বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ভূগর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলের ব্যবস্থাপনা অধিকার তুলে দেয়া যেতে পারে, যেন জনগনের জন্য নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সরবারহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এই ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভূমিকা সামনে আনা হয়েছে। এর আওতায়, নীতিপত্রে বলা হয়েছে; ক) ক্রমান্বয়ে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত সরকারি জল-প্রকল্প সমূহকে (পৌর প্রকল্প ব্যতীত) স্থানীয় ও সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া হবে। খ) ক্রমান্বয়ে ৫০০০ হেক্টরের বেশি সরকারি জল-প্রকল্প সমূহকে (পৌর প্রকল্প ব্যতীত) বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া হবে- এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহ লীজ বা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বীডের মাধ্যমে নির্বাচিত

[২৭] বিস্তারিত; ইনসিডিন বাংলাদেশ; ভূমিহীন ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ সুরক্ষার উপযোগী ভূমি ব্যাংকের কাঠামোগত প্রস্তাবনা, ২০১৪

[28] ড. আবুল হোসেন; বাংলাদেশে জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা: একটি পর্যালোচনা ; এএলআরডি আয়োজিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য প্রস্তুতকৃত নিবন্ধ; ২২ ডিসেম্বর, ২০০৮

ব্যবস্থাপনা চুক্তি বা স্থানীয় সরকার ও সংস্থার সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হবে। সেচের জন্য জাতীয় পানি নীতিতে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রেও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

তবে জাতীয় পানিনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উচ্চারণটি নীতিপত্রের সাথে বেসরকাফর তথা বাণিজ্যিক খাতের মিতালী ও অধিকারভিত্তিক জল ব্যবস্থাপনার সংঘাতের সূচনা করে তা হলো এই যে–নীতিপত্রে জলকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করে দাম বা মূল্য নির্ভর (বাজার) ব্যবস্থাপনার আওতায় জল সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর অনুষঙ্গ হিসেবে চলে এসেছে, তথাকথিত ব্যয়-উসুলের (cost recovery) প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে লীজ বা অন্যান্য বাজার পদ্ধতিতে পরিচালনা ও পরিচর্যার (O&M) খরচ তুলে আনতে বেসরকারি খাতকে সঙ্গী রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে না দেখে, নীতিপত্রে এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের দলের কাঁধেই ব্যয় বহনের দায় চাপানো হয়েছে। অন্য কথায় পানিকে পণ্য হিসেবে সর্বত্র সরবরাহ ও সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই নীতি কাঠামো দাতা গোষ্ঠী অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ- এর বেসরকারি খাত ও জন-স্বার্থের চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রাধান্য দেওয়ার নীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ –

১. জল সম্পদের উপর বেসরকারি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা কায়েম করতে এক ধোঁয়াটে পথ বেছে নিয়ে তারা বিকেন্দ্রীকরণের নীতির আড়ালে আসলে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণের চেষ্টায়রত। তারা দুর্বল স্থানীয় সরকারের দোহাই দিয়ে, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসছে।
২. জল-ব্যবহারকারীদের দল গঠন করে জল-প্রকল্পসমূহের ব্যয়-উসুল করবার আওতায় প্রকৃত প্রস্তাবে তারা জনমানুষের জল-অধিকারকে প্রতিস্থাপন করে বাজারের বা বাণিজ্যের অধিকারের নামে।[২৯]

এই দুই প্রক্রিয়াই জনমানুষের জলের উপর সার্বজনীন আধিকারকে খর্ব করে। উপরন্তু, উন্নয়নের নামে আর্সেনিক দুষণের কারণেও হ্রাস পেয়েছে মানুষের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির অধিকার। এখানেও সমন্বয় ও সুরক্ষা নীতির অনুপস্থিতি বড় প্রতিবন্ধকতা।
পানির অপচয় রোধ তথা সংরক্ষণের কথা বলে, পানিকে বিনা-মূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ না করে একটি অবচয়যোগ্য সম্পদ বিবেচনায় উপযুক্ত মূল্য কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার কথা বলে - আসলে জাতীয় পানি নীতিতে জলের উপর জনমানুষের অবাধ ও সার্বজনীন অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। আর নীতি কাঠামোর বাজার পক্ষপাতের পথ ধরেই বিদ্যমান পানি আইনের আওতায় জল-ব্যবস্থাপনায় বাজার ও বেসরকারি বাণিজ্যিক খাতের প্রাধান্যকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
সাধারণভাবে বিদ্যমান আইনের যে বিষয়গুলো পুণ:বিবেচনা করা জরুরি-

- আইনে **"পানি ব্যবহার অধিকার"**-এর আওতায় পানি ব্যবস্থাপনায় বাজার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি জনমানুষের স্বার্থ বিরোধী।
- কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারে অবচয় ও অপ-ব্যবহারের কথা বলে; জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে, জনগণের পানি ব্যবহারের সার্বজনীন অধিকারকে যে কোন সময় সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যাবে বলে আইনে বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান, প্রাকৃতিক পানির উৎসের ওপর কৃষক ও প্রান্তিক-গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চিরায়ত অধিকারকে নাকচ করছে।
- বিদ্যমান পানি আইনে লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে পানি ব্যবহার গোষ্ঠী বা সিন্ডিকেট তৈরির বিধান রাখা হয়েছে। এই লাইসেন্সের বলে জনগণের পানি ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়ার রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র প্রদত্ত লাইসেন্সিং-এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগকারী বা লাইসেন্সধারীদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বেশি বিবেচিত হবে। এতে জনগণের পানি ব্যবহারের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত বা বাণিজ্যিক স্বার্থে কুক্ষিগত হবে। প্রাকৃতিক পানির উৎসের ওপর এ ধরনের বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি।
- বিদ্যমান পানি আইনে, প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারের অধিকারের নামে জনগণের প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারকে শুধুমাত্র 'পান, স্নান, ধোলাই ও গৃহস্থলি কর্মে' সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এটি গৃহীত হলে, প্রাকৃতিক পানির ওপর জনগণের অধিকার খর্ব হবে।
- বিদ্যমান পানি আইনে, পানি দূষণ ও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পানির ধারাকে **'বাণিজ্যিক স্বার্থে আবদ্ধ'** করা আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে যথাযথভাবে বর্ণণা করা হয়নি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনে পানি সম্পদ দূষণ-রোধ ও সংরক্ষণ আইনের বিধিমালা হাল নাগাদ করার পাশাপাশি যদি কৃষি নীতিতে দূষণ-মুক্ত কৃষি সম্প্রসারণের দিক নির্দেশনা না থাকে ও সেই লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগ না থাকে তবে কৃষক স্বার্থ সুরক্ষা করা যাবে না। তারা তাদের অজান্তেই আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। খাদ্য নিরাপত্তা তথা নিরাপদ খাদ্যের বিবেচনা থেকে, প্রাথমিকভাবে পানি দুষণকারী কৃষি প্রযুক্তি আমদানি ও উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও পানি তথা প্রকৃতি-বান্ধব কৃষি উপকরণকেন্দ্রিক গবেষণা, উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার উৎসাহিত করার বিধি রাখা এখন সময়ের দাবী।

[২৯] Ali; AKM Masud; The water world at grassroots:Bangladesh & South Asia; INCIDIN Bangladesh, 2008

৩.১. জল-অধিকার তথা জল-নিরাপত্তার নাগরিক প্রস্তাবনাঃ

ভূমির মতই জল সম্পদ নিয়েও বর্তমানে নাগরিক পরিসরের প্রান্তিক মানুষের সাথে কর্পোরেশনের দ্বন্দ্ব এবং নাগরিক অধিকার বনাম বানিজ্যিক অধিকারের লড়াই চলছে- তবে এ লড়াই কেলল বাংলাদেশে নয়; চলছে বিশ্ব ব্যাপী। আজকের বিশ্বে জল সম্পদকে বেসরকারি খাতের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়:

১. সরকার কর্তৃক তার জনমানুষের জন্য গড়ে তোলা পানি সরবারহের ও পরিশোধণের পুরো অবকাঠামো ও সেবা ব্যবস্থাকে বেসরকারি খাতের হাতে তুলে দেয়া (যেমনটা ঘটেছে যুক্তরাজ্যে)।
২. বাণিজ্যিক সংস্থা/কর্পোরেশনের হাতে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ বা ছাড় দিয়ে বেসরকারি খাতকেই কার্যত পানি সরবারহের ও পরিশোধনের সম্পূর্ণ অবকাঠামো ও সেবা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার এবং সেবা মূল্য সংগ্রহের দ্বায়িত্ব হস্তান্তরিত করা (যেমনটা ঘটেছে ফ্রান্সে)।
৩. রক্ষণশীল বা ধীরে চলার নীতিতে বেসরকারি খাতের সাথে একটি নির্দিষ্ট অংকের প্রশাসনিক ফি'র বিনিময়ে চুক্তিভিত্তিক জল-সেবা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার ছেড়ে দেয়া হয় (দক্ষিণ এশিয়ায় পরিলক্ষিত ধারা)।

বিশ্ব ব্যাংক দেশে দেশে সরকারদের বুঝাতে স্বচেষ্ট যে, সামাজিক সেবার অংশ হিসাবে না দেখে জল-বিপণনকে বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে দেখতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্টপোষকতায়, বিভিন্ন পৌর এলাকায় বেসরকারি কর্পোরেশন গুলো নাগরিক পানি সরবরাহের কাঠামোয় বিনিয়োগ করতে খুবই তৎপর। কিন্তু এক হিসাব অনুযায়ী, এই কর্পোরেশনগুলো কোন বিনিয়োগ না করেই প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার সরকারি বিনিয়োগের ফায়দা লুটবে। আমাদের জাতীয় পানি নীতি প্রবর্তনের বছরেই (১৯৯৯) ভারতের চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, পুনা ও হায়দারাবাদে বেসরকারি কর্পোরেশন জল-বাণিজ্যে ঢুকে পড়েছে।[৩০] অন্যদিকে, আমাদের পানিনীতি ও আইনে একই পথের প্রস্তাবনা দেখা যায়। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বেসরকারি খাতের হাতে জল পরিসেবা ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার সুযোগ এখনও আছে। দেখা যাচ্ছে-

১. জাতীয় ও বহুজাতিক বেসরকারি কর্পোরেশনেরা যতই দায়িত্বশীল হোক না কেন তাদের পক্ষে কখনো সবার জন্য ন্যায় সম্মত পানির হিস্যা নিশ্চিত করা সম্ভব না।
২. যেহেতু বেসরকারি কর্পোরেশনেরা "টাকার বিনিময়ে জল " সরবরাহের নীতিতে পরিচালিত হয়, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষেরা কখনই তাদের চাহিদা মোতাবেক সেবা পায় না।
৩. বেসরকারি কর্পোরেশন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রণোদনা ও অগ্রাধিকার ধারণ করে না।
৪. যেহেতু মুনাফা বৃদ্ধিই বেসরকারি কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য, কাজেই তারা প্রায়শই পানি ব্যবহার বৃদ্ধির দিকেই জোর দেয়। এর ফলে জল-সম্পদ সংরক্ষণের নীতি বাস্তবায়ন প্রশ্ন বিদ্ধ হয়।[৩১]

আমরা ক্রমাগত দেখছি যে, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সরবরাহের নীতি, আইন ও পরিকল্পনায় জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে, জনমানুষের এ প্রসঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যাচ্ছে অথচ বেড়েই চলেছে কর্পোরেশন আর আন্তর্জাতিক দাতাদের দৌরাত্ম্য। এর পিছনে কাজ করছে এক বিশাল ব্যবসায়িক স্বার্থ ও বাজার সম্ভাবনা। এক হিসাব আনুসারে, প্রতি ২০ বছরে পানির চাহিদা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে, ২০২৫ সালে পানির চাহিদা বিশ্বের মোট পানির সরবরাহের চেয়ে প্রায় ৫৬ শতাংশ বেশি হয়ে যাবে।[৩২] এই বাজার সমীকরণ, পানিকে কেবল জাতীয় পর্যায়ে পণ্যে রূপান্তরিত করছে না - জল পরিচলন ও ব্যবস্থাপনা সেবা হয়ে ওঠছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ। এ কারণেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গ্যাটস চুক্তি (সেবা খাতের সাধারণ চুক্তি) একটি দেশকে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক কর্পোরেশনের পক্ষে অন্য সদস্য রাষ্ট্রের সেবা খাত সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার দেয়। এর ফলে কোন একটি রাষ্ট্রের জাতীয় জল-ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক জল-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য চাপ প্রয়োগ করাও যেতে পারে। গ্যাটস'এর আওতায় রাষ্ট্রসমূহকে তার রাষ্ট্রীয় সেবা কাঠামো সমুহকে (যেমন, জল সরবরাহ ও পরিশোধন ইত্যাদি) বজায় রাখতে হলে "প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা*"র (necessity test)* মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় পরিষেবা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।[৩৩] কাজেই পানি নীতি ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সব চাপ ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক আগ্রাসনের মুখে জনগণের পানির অধিকার সুরক্ষার যথাযথ প্রতিবিধান খুঁজতে হবে।

---

[৩০] **Water Privatisation And Water Wars, July 14, 2005 By Vandana Shiva & Ann Ninan; India Resource Center; April 16, 2003**

[৩১] ***Source: Global water grab: Polaris Institute***

[৩২] ***Global water grab: Polaris Institute***

[৩৩] ***Global water grab: Polaris Institute***